‘বনলতা সেন’ কাব্যের কবি জীবনানন্দ— এক শূন্যগর্ভ সময় প্রেক্ষাপটের রূপকার

শোভন ঘোষ

সংক্ষিপ্তসার

‘বনলতা সেন’ কাব্যের আত্মপ্রকাশ ১৯৪২ সালে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ তখন মধ্যগগনে। ১৯৪২ এর পূর্ববর্তী ১৪ বছর সময় ধরে কবিতাগুলির জন্ম। ভারতীয় রাজনীতিতেও অস্থির সময়। ঘটে যাচ্ছে নানা মানবিক ও সামাজিক বিপর্যয়। তারই প্রেক্ষাপটে রচিত এই কাব্যের কবিতাগুলি। কবিতাগুলিতে যুগযন্ত্রণার চিহ্ন কিভাবে ধরা পড়েছে জীবনানন্দের কলমে তাই শিরোনামের আলোচ্য বিষয়।

আধুনিক বাংলা কবিতার কালসীমা নিয়ে যেমন বিতর্ক আছে, তেমনি তার স্বরূপ নিয়েও তর্ক কম নেই। নাগরিকতা, অবিশ্বাসী মনোভাব, সংশয়-সন্দেহ, নৈরাশ্য, বিদ্রোহী মনন, অনিকেত মনোভাব, প্রশ্নাতুরতা, জীবনময়তা, ভোগবাদী দর্শন, ফ্রয়েডের তত্ত্ব, মার্কসের সমাজবাদ, সময়চেতনা, ইতিহাসবোধ, নাস্তিকতা ইত্যাদির তালিকা যতই দীর্ঘ হোক না কেন; তবু তার সমগ্রকে ধরা গেছে একথা বলা যাবে না কখনও। বিভিন্ন সমালোচক ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে আধুনিক কবিতাকে ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা করেছেন, বলাবাহুল্য তাতে সর্বত্রই যে সমৃদ্ধির বার্তা বয়ে এনেছে এমন নয়; বরং অনেকক্ষেত্রে অবস্থান করেছে তার বিপরীত মেরুতেও।

বাংলা আধুনিক কাব্য-জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি জীবনানন্দ দাশও তাঁর সমকালে বিরূপ সমালোচনার শিকার হয়েছিলেন। অন্যান্য কবিদের চেয়ে একটু আলাদাভাবেই। কারণ তাঁর কাব্য বা কবিতা সমালোচনা শুধু কতিপয় ব্যক্তি বিমুখই ছিল না, ছিল সমকাল বিমুখও। সমালোচকদের নিষ্ঠুর ও তীব্র সমালোচনায় তিনি শুধু নীরব ছিলেন, Byron এর মতো ব্যঙ্গের বাণ নিক্ষেপ করেই ক্ষান্ত থাকতেন। ফলস্বরূপ স্বভাবধর্মে অন্তর্মুখীন, নির্লিপ্ত, নির্জনতাপ্রিয় এবং প্রত্যুত্তরবিমুখ এই কবি সমকালে সামান্যতম জনপ্রিয়তা পেয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের মতো মহৎহৃদয়, বৃহৎমনা, গুটিকয়েক ব্যক্তি ছাড়া আর খুব বেশি কেউ বুঝতে পারেননি তাঁকে। জীবনানন্দকে লেখা একটি চিঠিতে কবিগুরু জানান—

> “তোমার কবিত্বশক্তি আছে তাতে সন্দেহ মাত্র নাই।— কিন্তু ভাষা প্রভৃতি নিয়ে এত জবরদস্তি কর কেন বুঝতে পারিনে। কাব্যের মুদ্রাদোষটা ওস্তাদিকে পরিহাসিত করে।”[১]

আবার জীবনানন্দের ‘মৃত্যুর আগে’ কবিতাটি পড়ে রবীন্দ্রনাথ, বুদ্ধদেব বসুকে একটি চিঠিতে লেখেন—

অতিথি-অধ্যাপক পিংলা থানা মহাবিদ্যালয়

"জীবনানন্দ দাশের চিত্ররূপময় কবিতাটি আমাকে আনন্দ দিয়েছে।"[২]

জীবনানন্দের সমকালীন সাহিত্য ব্যক্তিত্ব এবং তাঁর পরিবার-পরিজনবর্গের স্মৃতিকথা থেকে, জীবনানন্দ সম্পর্কে অনেক তথ্য জানা যায়। জীবনানন্দ ইশ্বরবিশ্বাসী কর্তব্যসাধক পিতা সত্যানন্দ দাশ এবং মহৎপ্রাণা কবিসত্তাধিকারিণী মাতা কুসুমকুমারী দেবীর কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিলেন সহজাত প্রতিভালোক। এছাড়াও তাঁর জীবনে ব্রজমোহন স্কুলের হেডমাস ার আচার্য্য জগদীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের অবদান ছিল অপরিসীম। মানব জীবনসত্য সম্পর্কে সত্যানন্দ দাশ ছিলেন গভীরভাবে ভাবিত এবং ছিলেন গভীর আত্মজিজ্ঞাসুও। মানব জীবনের মূল সত্যোপলব্ধির ক্ষেত্রে তিনি সবসময় এই প্রশ্নে ভাবিত ছিলেন যে — "তুমি কি করতে এসেছ অসীম দেশ ও অসীমকালের এক প্রান্তে?"[৩] নিরন্তর এই প্রশ্নজিজ্ঞাসু ঈশ্বরসাধক পিতা জীবনান্দের চিত্তে বৈদিক সভ্যতার আলো দান করেছিলেন। আর পিতার এই প্রশ্নই যেন পুত্রের মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছিল সারাজীবন। রবার্ট ফ্রস্ যেমন বলেছেন—

"The woods are lovely dark and deep
But I have promises to keep
And miles to go before I sleep
And miles to go before I sleep.''[৪]

(Stopping by Woods on a Snowy evening)

জীবনানন্দ বোধহয় তেমনই দায়বদ্ধ ছিলেন মানুষ ও প্রকৃতির কাছে। সমাজ ও সংসারের উপর অনেকটা বিরূপ হয়েই তিনি প্রকৃতির ধ্যানে মগ্ন হয়ে উঠেছিলেন। শিশুকাল থেকে চিরদিনই প্রকৃতি তাঁকে হাতছানি দিয়ে ডেকেছে, আর জীবনানন্দের উপর তো তাঁর মাতৃভূমি বরিশালের প্রভাব ছিল অপরিসীম। এই নিবিষ্ট, আত্মসমাহিত কবিকে প্রকৃতি তাই ছলনা করেনি। চিত্রকরের তুলিকা ধারণ করে তিনি এই রূপ-রস-গন্ধময় শ্যামলা ধরণীর সমস্ত রূপ ও সমারোহ, প্রকৃতির মনোরাজ্যের সমস্ত রহস্যকে অত্যন্ত স্বচ্ছন্দতার সঙ্গে অনুভূতির রাজ্যে নিয়ে আসতে সক্ষ ম হয়েছিলেন। সাহিত্যের বিষয়বস্তু থেকে শব্দচয়ন সর্বত্রই তিনি অনায়াস পারঙ্গমতা দেখিয়েছেন। প্রকৃতির রূপাঙ্কনের মধ্য দিয়ে মানব জীবনভাষ্যকে তুলে ধরতে গিয়ে তাঁর কবিতা হয়তো অনেক সময়ই বৌদ্ধ সহজিয়াদের পদের মতো আমাদের কাছে দুর্বোধ্য ঠেকেছে। কিন্তু মানবজীবনের সঙ্গে প্রকৃতির এহেন অভূতপূর্ব মেলবন্ধনে তাঁর কবিতা যে তুলনারহিত তা বলার অপেক্ষা রাখে না। আর তিনিও যে এ পথের নিঃসঙ্গ এক পথযাত্রী তাও বোধহয় সকলেই স্বীকার করবেন।

যে কোনো সৃষ্টিরই থাকে প্রেক্ষাপট। মৃত্তিকার উপর যেমন ফসল ফলে, গাছ জন্মায় তেমনি একই প্রেক্ষাপট থেকে সৃষ্টি হয় বিবিধ শিল্পকলার। তা সে উপন্যাস, নাটক, ছোটগল্প, সঙ্গীত, চিত্রকলা যাই হোক না কেন। খুব উল্লেখযোগ্য ব্যাপার যে প্রত্যেক সৃষ্টিতেই তার দেশ,কাল, প্রেক্ষাপটের ছাপ থেকে যায়। যেহেতু আমরা একথা জানি এবং মানি যে কোনো স্রষ্টা বা কোনো শিল্পীই স্বয়ম্ভূ নন্। আর সৃষ্টিও অপার্থিব নয়, পার্থিব ব্যাপার। ফলস্বরূপ সকল সৃষ্টিতেই কম-বেশি প্রতিফলিত হয় স্রষ্টা বা শিল্পীর সমকালীন সমাজ ও সময়। অবশ্য এটাই সৃষ্টির শেষ কথা নয়। তাই তো সে অন্য গুনে সর্বস্থানিক, সর্বকালীন এবং সর্বজনীন। আমাদের আলোচ্য 'বনলতা সেন' কাব্যেরও একটা প্রেক্ষাপট আছে, আর অনিবার্যভাবেই তার ছায়া পড়েছে কবিতাগুলিতে।

"এই পৃথিবীর রণ রক্ত সফলতা
সত্য; তবু শেষ সত্য নয়।"[৫]

(সুচেতনা)

কবিতার এই উদ্ধৃতির মধ্য দিয়েই কবিমানসের স্পষ্ট ছায়া প্রতিফলিত হয় পাঠকের মনো-মুকুরে। স্বার্থ, হিংসা, সংকীর্ণতা, অশুভ বুদ্ধি প্রভৃতিই যুদ্ধের মূল; দেশ-কাল-পাত্র ভেদে এর হিসেবে করলেও ব্যতিক্রম মিলবে না কোথাও। কিন্তু কবি মন সর্বমানবিক, পৃথিবীর সমস্ত মানুষের, সমস্ত জীবের কল্যাণই তাঁর ঈপ্সিত বস্তু। জীবনানন্দও কবি, তাই তাঁর উপরিউক্ত মঙ্গলোচ্চারণ অপ্রকাশিত থাকেনি। মানবজীবনকে রূপ দিতে গিয়ে কবি বিভিন্ন চিত্রকল্পের, ব্যঞ্জনার, প্রতীকের আশ্রয় নিয়েছেন। প্রকৃতির প্রেক্ষাপটে মানবজীবনকে এমনভাবে বিধৃত করেছেন যে, প্রকৃতিই যেন চরিত্র হয়ে গেছে।

"বালির উপরে জ্যোৎস্না— দেবদারু ছায়া ইতস্তত
বিচূর্ণ থামের মতো : দ্বারকার;— দাঁড়ায়ে রয়েছে মৃত, ম্লান।"[৬]

(হাজার বছর শুধু খেলা করে)

জীবনানন্দের কবিতা অনেকসময়ই জটিল, প্রকৃতির মতো রহস্যময়ী, নদীর মতো গহন এবং গভীর। কিন্তু এসব কিছুর আবরণ সরিয়ে ফেললে আমরা প্রবেশ করি সমাজ মনস্তত্ত্বের সেই অন্তরতম প্রদেশে যেখানে শোষক-শোষিত বা শাসক-শাসিতের চিত্র ফুটে ওঠে। এই শোষকের হাত থেকে মুক্তি বা শাসকের হাত থেকে মুক্তিই তো চিরকালীন কবি মানসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বাণীসম্পদ। জীবনানন্দের কাব্যও এই সম্পদ বাণীরূপ লাভ করেছে কিছুটা ভিন্নভাবে, আর এখানেই তিনি আধুনিক কাব্যজগতের এক ব্যতিক্রমী পথযাত্রী। অন্যান্য কবিদের মতো সময়ের শিকার হননি তিনি, সময়কে শিকার করেছেন। তাই তাঁর কাব্যে সময়চেতনা এতখানি ব্যপ্ত। তার তিনিও তাই সময়ের প্রেক্ষাপটে বিদ্রোহী নন্, এক চিরকালীন যুগের প্রবক্তা।

"ভোর;
সারারাত চিতাবাঘিনীর হাত থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে
নক্ষ ত্রহীন, মেহগনির মতো অন্ধকারে সুন্দরীর বন থেকে
অর্জুনের বনে ঘুরে ঘুরে
সুন্দর বাদামী হরিণ এই ভোরের জন্য অপেক্ষা করছিল।"[৭]

(শিকার)

জীবনানন্দের কবিসত্তার বিভিন্ন দিক রয়েছে যা কাব্যবিশেষে বা কবিতাবিশেষে বিশিষ্ট রূপ গ্রহণ করেছে। সময়চেতনা সে হিসেবে বিশেষ এক উল্লেখযোগ্য দিক। কিন্তু আমাদের আলোচ্য বিষয় যে সময় প্রেক্ষাপটে তিনি জন্মগ্রহণ করেছেন এবং সর্বোপরি যে সময়ের উপর দাঁড়িয়ে সৃষ্টি হয়েছে তাঁর কবিতা। জীবনানন্দের কাব্যজগতের সর্বোচ্চ, সুচারু ও সর্বশ্রেষ্ঠ মিনার 'বনলতা সেন'। একথা বললে বোধহয় খুব বেশি ভুল বলা হবে না যে, সে উচ্চতাকে ব্যঙ্গ বা পরিহাসিত করতে বিরূপ সমালোচকদের দৃষ্টি কুলায়নি এবং একথাও সর্বজন স্বীকৃত যে এই কাব্যই তাঁকে জনপ্রিয়তার অন্যতম শিখরে পৌঁছে দিয়েছে।

'বনলতা সেন' কাব্যের কবিতাগুলির রচনাকাল ১৩৩২-১৩৪৬ বঙ্গাব্দের মধ্যে অর্থাৎ খ্রিস্টাব্দের দিক থেকে ধরলে ১৯২৫-১৯৩৯ এই ১৪ বছর সময়কাল ধরে। আর 'বনলতা সেন' কাব্যের আত্মপ্রকাশ ১৯৪২ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মধ্যগগনে। কাব্যগ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয় 'কবিতাভবন' থেকে 'এক পয়সার একটি' গ্রন্থমালার অন্তর্ভুক্ত হয়ে মোট ১২টি কবিতা নিয়ে। পরে 'সিগনেট প্রেস' থেকে কাব্যটির দ্বিতীয় সংস্করণ বের হয় ১৩৫৯ বঙ্গাব্দে অর্থাৎ ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের দিকে। এই সংস্করণে আরও ১৮টি নতুন কবিতা যুক্ত হয়। ফলে কাব্যের মোট কবিতার সংখ্যা দাঁড়ায় ৩০টি। অতএব দেখা যাচ্ছে যে এই ৩০টি কবিতার রচনাকাল বেশ খানিকটা দীর্ঘ সময় ধরে। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে ঘটে গেছে বিশ্বযুদ্ধ, ক্ষুধা-অন্নাহার, দাঙ্গা, কালোবাজারী, বেকারত্ব সর্বোপরি সামাজিক ও রাষ্ট্রিক নানান সামাজিক ও মানবিক বিপর্যয়। কিন্তু খুব উল্লেখযোগ্য ব্যাপার এ সবের চিত্র প্রত্যক্ষ ভাবে জীবনানন্দের কবিতায় খুব বেশি আসেনি, পরোক্ষ ভাবেই তার রূপায়ণ ঘটেছে বেশি। ফলস্বরূপ বোমা-বারুদ, রক্তপাত, যুদ্ধ-দাঙ্গা এ সবের জীবন্ত চিত্র তাঁর কাব্যে ততটা নেই, যতটা আছে এ সবেরই কারণে আন্দোলিত, ছিন্নমূল, বি বস্ত, তিমিরাবৃত মানুষের কথা। আর জীবনানন্দ এ সব থেকে দূরে সরে যেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু কবিতায় বিষয় থেকে তিনি দূরে সরে যেতে পারেননি। তাই নানা অনুষঙ্গে, রূপকে, চিত্রকল্পে ধরা পড়েছে সেই সকল ঘটনারই পরোক্ষপ্রতিচ্ছায়া। যেখানে কবি ভাষ্যকার হিসেবে তিনি সমকালিক নন্, সর্বকালিক।

"কেবলি জাহাজ এসে আমাদের বন্দরের রোদে
দেখেছি ফসল নিয়ে উপনীত হয়;
সেই শস্য অগণন মানুষের শব;"[৮]

(সুচেতনা)

জীবনানন্দের তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ 'বনলতা সেন'। কবি তাঁর জীবনের প্রথম পর্বে আপন প্রবণতাবশত অতি স্বাভাবিকভাবেই এত রণ-রক্ত কোলাহল থেকে সরে যেতে চেয়েছিলেন। তাঁর এই আত্মসমাহিত হওয়ার বাসনার মূলে ছিল বরিশালের ভূ-প্রকৃতি। তিনি দেখতে ভালবাসতেন চিল, বুনোহাঁস, ভোরের দোয়েল পাখি, মধুকূপী ঘাস, ধানসিড়ি নদী, কীর্তিনাশা পদ্মা, ধানখেতে শুয়ে থাকা অলস রোদ প্রভৃতি। পৃথিবী যেন তাঁর কাছে মায়াবী নদীর দেশ, সেইখানেই দুইপা ছড়িয়ে অবসর উপভোগ করতে চান তিনি। কিন্তু বাহ্যিক পৃথিবীর এই রণ-রক্ত কোলাহল, মানুষের হৃদয়হীনতা দেখে কবি-হৃদয় ঘৃণায়, বেদনায়, আক্রোশে ভরে গিয়েছে। তাই তিনি উচ্চারণ করেন—

"গভীর অন্ধকারের ঘুমের আস্বাদে আমার আত্মা লালিত;
আমাকে কেন জাগাতে চাও ?
হে সময়গ্রন্থি, হে সূর্য, হে মাঘনিশীথের কোকিল, হে স্মৃতি,
হে হিম হাওয়া,
আমাকে জাগাতে চাও কেন।"[৯]

(অন্ধকার)

অন্ধকার কবিতার এই উচ্চারণে তিনি চিহ্নিত হন পলাতক কবি, জীবনবিমুখ রূপে। যে কালে তিনি জন্ম নিয়েছেন তারই উত্তাপ জ্বালা কবিকে নীলকণ্ঠ করেছে এবং সেই বিষজ্বালা থেকে কবি পরিত্রাণের জন্য

অন্তর্মুখী আর তিমিরাভিসারী হতে চেয়ে বলে উঠেন—

"কোনোদিন জাগব না আমি— কোনোদিন জাগব না আর—"[১০]

(অন্ধকার)

সময়ের পোড়া দাগের যন্ত্রণায় অকপট সত্যভাষণে কবি বলে দেন ব্যাঘ্রযুগে শুধু মৃত হরিণীর মাংস পাওয়া যায়। সেদিন জীবনানন্দের এই মানসিকতা কেউ বুঝতে চাননি, হয়তো বা পারেননিও; তাই তাঁর বিদূষণে মুখর হয়েছিলেন সবাই। গভীর নতুন এক বীজগণিত দিয়ে তিনি পৃথিবীকে বুঝতে চেয়েছিলেন। সংসার বাস্তবিক কি ভয়াবহ! এখানে মূর্খ আর রূপসীর ভয়াবহ সঙ্গম 'সব ক্বাথ বাথরুমে ফেলে', ক্লেদাক্ত মলিন সূর্যও এই মৃত মুমূর্ষু পৃথিবীতে 'বেহেড আত্মার মতো'। আধুনিক যুগের অর্থহীন কোলাহল, নরনারীর কাম-বিকার কোটি কোটি শুয়রের আর্তনাদ নিয়ে এসেছে আকুলতর কবির কাছে। ফবিস রা যেমন প্রাধান্য দেন রঙকে, ফিউচারিস রা গতিকে, কিউবিস রা গঠন ও আকৃতির বিন্যাসকে, এক্সপ্রেসনিস রা বিকার ও অনুভূতির আবেগময় অভিঘাতকে, সুররিয়ালিস রা মগ্নচৈতন্যের অতলতাকে, রিয়ালিস রা যথাযথ বর্ণনাকে, ইমপ্রেসনিস রা আলো-ছায়ার খেলাকে, জীবনানন্দ তেমনি তাঁর শব্দতুলিকার দ্বারা, সরু-মোটা নানা বর্ণে রঞ্জিত করেছেন তাঁর কবিতাকে। ফলস্বরূপ কবিতা হয়ে উঠেছে অনেকখানি দুর্জ্ঞেয়। জনৈক সমালোচকের মতে বিংশ শতাব্দীর স্বপ্ন ও যন্ত্রণার কথা, চেতনা, অবচেতনা ও সুচেতনার কথা জীবনানন্দের কাব্যে সর্বতোভাবে প্রবাহিত।

"মানুষের সঙ্গে মিশেন না কেন?"[১১]

এর উত্তরে শোনা যেত 'ভালো লাগে না।'[১২] এই নির্বাক, নির্জনতাপ্রিয় আত্মমগ্ন, ধ্যানস্থ কবি বরিশালের গ্রাম্য জীবন ছেড়ে অসুস্থ হয়ে উঠেছিলেন কলকাতায়। তিনি সর্বদাই এক অ-মানবীয় মনোময় রহস্যালোক সৃষ্টি করে তার মধ্যে বসে থাকতে ভালোবাসতেন। তাঁর জীবনদর্শনে ছিল বিষণ্ণতার ভাব। নির্বিরোধী, স্বল্পবাক্ এই কবি বাংলার নিজস্ব প্রকৃতি ও মাটির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংযোগ রেখেছিলেন। তাই 'ঘাস' কবিতায় কেবল তিনিই বলতে পারেন—

"এই ঘাসের শরীর ছানি— চোখে চোখ ঘষি,
ঘাসের পাখনায় আমার পালক,
ঘাসের ভিতর ঘাস হয়ে জন্মাই কোনো এক নিবিড় ঘাস-মাতার
শরীরের সুস্বাদ অন্ধকার থেকে নেমে।"[১৩]

(ঘাস)

বাহ্যপ্রকৃতির সঙ্গে কবিপ্রাণের এহেন একাত্মতা বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। যেখানে কবি ঘাসের ঘ্রাণ হরিৎ মদের মতো গেলাসে গেলাসে পান করবেন, পুরোপুরি একাত্ম হয়ে যাবেন তার সঙ্গে। যেমনভাবে মিলনোন্মুখ পুরুষের সঙ্গে একাত্ম হয় মিলনরতা নারী, বিহঙ্গের দল যেভাবে পক্ষ বিস্তারে মিলনবদ্ধ হয় ঠিক সেইরকম। আবার অন্যদিকে কবি বিশ্বভুলে নিরাপদ আশ্রয়ের প্রার্থনা করবেন কোন এক নিবিড় ঘাসমাতার গর্ভে। আসলে জীবনানন্দের প্রকৃতিপ্রেম ও পলায়নপরতার মূলে কবি-স্বভাব বা কবি-ধর্ম থাকলেও, অন্যতর একটি ব্যাপার ছিল। তা হল গভীরতর কঠোর বাস্তবতা থেকে মুক্তি। যেখান থেকে শান্ত, নির্বিরোধী, নির্জন

মানুষেরা স্বাভাবিকভাবেই মুখ ফিরিয়ে নেন। জীবনানন্দের ক্ষেত্রেও অনেকটা সেরকম হয়েছিল। তাই তাঁর পলায়নমুখিতা কবিপ্রাণ বা কবিধর্মের প্রকাশই নয়, একইসাথে সমকালীন জ্বলন্ত সমাজ থেকে পরিত্রাণের চেষ্টাও। বলাবাহুল্য পোড়া দাগের যন্ত্রণা সেক্ষেত্রে অপ্রকট থাকেনি। কবিভ্রাতা অশোকানন্দের কথায়—

"জীবনানন্দের পূর্বে কোনও বাঙালি কবি এতখানি বিশ্বস্ততার সঙ্গে প্রকৃতির ভাণ্ডারের ঐশ্বর্য ও মহিমা আমাদের অনুভূতির রাজ্যে নিয়ে এসেছেন এমন কথা আমার জানা নেই। শব্দ; স্পর্শ এমনকি স্বাদ ও গন্ধ পর্যন্ত তাঁর চিত্রমুকুরে প্রতিবিম্বিত হয়েছে। এই অপূর্ব কবিতার স্বাদগ্রহণ করে পাঠকের 'ইমাজিনেশন' তৃপ্তি পায়।"[১৪]

দুই বিশ্বযুদ্ধে পূর্ববর্তী পুরাতন যুগের সমস্ত মূল্যবোধ ভেঙে গেছে অথচ তার পরিবর্তে নতুন কোন মূল্যবোধ এখনও গড়ে ওঠেনি। যুগসন্ধিক্ষ ণের শূন্যগর্ভ সময়ে শূন্যতার বেদনাকেই তিনি ব্যক্ত করতে চেয়েছিলেন ব্যক্তিগত সংরাগের স্পর্শে—

"জীবন গিয়েছে চলে আমাদের কুড়ি কুড়ি বছরের পার—
তখন হঠাৎ যদি মেঠো পথে পাই আমি তোমার আবার!"[১৫]

(কুড়ি বছর পরে)

মানবিক অসহায়তার প্রতি সীমাহীন সহানুভূতিকে ব্যক্ত করতে গিয়ে, জীবন পরিবেশের অমোঘ পরিণাম সম্পর্কে যে নিগূঢ় অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় তিনি দিয়েছেন তাতে বিস্মিত অভিভূত বোধ করতে হয়।

"হয়তো গুলির শব্দ;
আমাদের তির্যক গতিস্রোত,
আমাদের পাখায় পিস্টনের উল্লাস,
আমাদের কণ্ঠে উত্তর হাওয়ার গান!"[১৬]

(আমি যদি হতাম)

জীবনানন্দের তাঁর 'কবিতার কথা' প্রবন্ধে জানিয়েছেন— "তার প্রতিভার কাছে কবিকে বিশ্বস্ত থাকতে হবে; হয়তো কোনো একদিন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কবিতার সঙ্গে তার কবিতাবৃত্ত প্রয়োজন হবে সমস্ত চরাচরের সমস্ত জীবের হৃদয়ে মৃত্যুহীন স্বর্ণগর্ভ ফসলের ক্ষে তে বুননের জন্য।"[১৭]

(কবিতা, বৈশাখ, ১৩৪৫)

প্রতিটি যুগেরই নিজস্ব একজন কবি থাকেন, তাঁরই কণ্ঠে সেই বিশেষ যুগের আশা-আকাঙ্ক্ষা, চাওয়া-পাওয়া, বেদনা আর ব্যর্থতাবোধের কথা শুনতে পাই আমরা। সেদিক থেকে দেখতে গেলে জীবনানন্দ দাশকে তাঁর সমসাময়িক যুগপর্বের নিজস্ব কবি বলে চিহ্নিত করা যেতে পারে। বুদ্ধদেব বসুর ভাষায় তাঁর কাছেই আমাদের শিক্ষা রয়েছে একথা যে হঠাৎ কোন উচ্ছ্বাসে বা কোনও বিশেষ ঘটনার ঝোঁকে পড়ে কবিতা রচনা হয়তো সম্ভব কবি হওয়া সম্ভব নয়।

যুগসময়ের প্রেক্ষ াপটে রক্তাক্ত হয়েছেন কবি। সময়ের গহন কুটিল আবর্তে মানবজীবন যখন বি বস্ত, তখন নর-নারীর প্রেম, ভালোবাসা, সৌন্দর্যচেতনাকে শিকার করে নিয়ে গেছে শিকারীর দল। তাই কবি কখনো বনহংস হতে চেয়ে আশ্রয় চেয়েছেন কোন এক জলার ধারে ছিপছিপে শরের ভিতর নিরালা এক

নীড়ে, কখনো ঘাসের ভিতর ঘাস হয়ে জন্মাতে চেয়েছেন কোন এক নিবিড় ঘাসমাতার গর্ভে, কখনো তিনি অন্ধকারের স্তনের ভিতর, যোনির ভিতর অনন্ত মৃত্যুর মতো মিশে থাকতে চেয়েছেন, কখনো আবার প্রেমিকার মতো অনুরাগে 'স্বপ্নের বনিরা' কবিতায় স্থবিরতাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন,—

"স্থবিরতা, কবে তুমি আসিবে বল তো।"[১৮]

(স্বপ্নের বনিরা)

মানবজীবন বা যুগজীবনের বীভৎসতাকে অপরাপর অন্যান্য কবিদের মতো ব্যক্ত করেননি তিনি, সবকিছুকেই আত্মস্থ করে নিয়েছিলেন এক ব্যতিক্রমী কবিসত্তায়, ব্যক্ত করেছিলেন এক অভূতপূর্ব, অনন্য অনুভবে। প্রতিবাদ করেননি, বিদ্রোহী হয়ে উঠেননি, অনবদ্য ভাষা আর অশ্রুতপূর্ব চিত্রকল্পে পৃথিবীর গভীর গভীরতম অসুখকে বিধৃত করেছেন 'সুচেতনা' কবিতায়—

"পৃথিবীর মানুষকে মানুষের মতো
ভালোবাসা দিতে গিয়ে তবু,
দেখেছি আমারি হাতে হয়তো নিহত
ভাই-বোন বন্ধু পরিজন পড়ে আছে;
পৃথিবীর গভীর গভীরতর অসুখ এখন;''[১৯]

(সুচেতনা)

প্রেমের জগতে মানুষ-মানুষীর ক্ষু দ্র হৃদয় আর সংকীর্ণ মনের পরিচয় পেয়ে অস্থির হয়ে উঠেছিলেন কবি। যে প্রেম নর-নারীকে কাল থেকে কালান্তরের পথে নিয়ে যায়, অমরত্ব দান করে সে প্রেমের পরিচয় বোধহয় কবি খুব বেশি পাননি। তাই মহাসময়ের সঙ্গে মহাজীবনের যে অনুভব তিনি মনে বহন করেছেন, তাকে রূপ দিতে গিয়ে যাত্রা করেছেন ইতিহাসের ধূলি ধূসর পথে। শঙ্খমালার মতো নারীকে পৃথিবী একবারই পায় তারপর আর পায় না। একই নক্ষ ত্র, আলো, পৃথিবীর পরে দু'জন থাকলেও বহুদিন কেউ কারো খোঁজ করে না। আর তখনই চিরন্তন, শাশ্বত প্রেমের বোধে দোলায়িত, সংশয়ান্বিত কবিমন বলে ওঠে—

"এই পৃথিবীর ভালো পরিচিত রোদের মতন
তোমার শরীর; তুমি দান করো নি তো;''[২০]

(সুদর্শনা)

আর এই প্রেমের কারণেই তিনি পাড়ি দিয়েছেন ভারত সমুদ্র, ভূমধ্যসাগর কিংবা টায়ার সিন্ধুর পারে কোনো এক বিস্মৃত নগরীর পারস্য গালিচা, কাশ্মীরি শাল, মুক্তা-প্রবাল সুসজ্জিত মূল্যবান আসবাবে ভরা কোন এক প্রাসাদে নগ্ন নির্জন হাতের প্রত্যাশ্যায়। ধানসিড়ি নদীর ধারে চিলকে কাঁদতে বারণ করেন কোন এক মানুষীর ম্লান চোখ মনে পড়ে যাবে বলে।

লোকালয়ের সমুদ্রতীরে দাঁড়িয়ে, বিগত মহাযুদ্ধের বিক্ষু ব্ধ আবর্তে জীবনানন্দ প্রথম থেকে খুবই অস্বস্তি বোধ করেছিলেন। যুদ্ধকালীন মানুষকে লোভের পর্বতে উঠতে দেখে, বিরংসার গহ্বরে নামতে দেখে স্বল্পবাক্ কবি প্রায় নির্বাক হয়ে গেছেন। নিঃসঙ্গ বিহঙ্গের মতো নির্জন দ্বীপে আশ্রয় চেয়েছেন এই লোকালয়,

মানবসমাজ থেকে মুক্তি চেয়ে। মহৎ কবি মাত্রেই চিন্তা চেতনায় আমাদের থেকে অনেক দূর এগিয়ে থাকেন, তাই তাঁর কবিতা অনেক সময় অস্পষ্ট বা দুর্বোধ্য ঠেকে আমাদের। আবার একথাও অস্বীকার করার উপায় নেই যে জীবনানন্দের অনেক কবিতায় অসুস্থ মানসিকতার প্রতিফলন ঘটেছে, ফলস্বরূপ অনেক সময়ই তা দুর্বোধ্য হয়ে গেছে। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের মতে—

> "তাঁর লাইনগুলির মধ্যে একটা অপার বিস্ময়বোধ আছে, আমার মনে হয় সেটাই জীবনানন্দের কবিতার শেষ কথা।"[২১]

আধুনিক যুগের বিদগ্ধ কাব্য-সমালোচক সুমিতা চক্রবর্তী বলেছেন—

> "সাহিত্যে শুচিবায়ুতার দিন অনেককালই অবসিত। তবু এই শূন্যগর্ভ সময়ের প্রতি যে ঘৃণার তীব্রতা জীবনানন্দের কলমে প্রকাশিত তেমন প্রকাশ আর কারো লেখায় দেখি না। আসলে এত ঘৃণাও কেউ করেননি। দিনকালের সঙ্গে মনের একটা বোঝাপড়া করে নিয়েছিলেন আর সকলেই; ঠিকঠাক গুছিয়ে নিয়েছিলেন জীবনটাকে। শুধু জীবনানন্দই পারেননি। চিরকালই থেকে গিয়েছিলেন অন্যমনস্ক, সঙ্গহীন, নিরানন্দ, বস্তুসাফল্যের জগতে আর সকলের চেয়ে ব্যর্থ এবং বহুজনের কাছেই শেষপর্যন্ত নির্মমভাবে উপহাসিত একজন মানুষ। জীবনানন্দকে তুলনা করতে ইচ্ছে করে শুধু রবীন্দ্রনাথের সঙ্গেই। কালের নির্মম অসঙ্গতিকে প্রাণপনে শোষন করে নিয়ে নির্মোহ-দৃষ্টি রবীন্দ্রনাথ শেষ পর্যন্ত ঘৃণাকে অনুচ্চার রেখেই ব্যক্ত করতে পেরেছিলেন মানুষের প্রতি অটল ভালোবাসা। জীবনানন্দ এই সর্বাঙ্গ-সূচীমুখ বিপুল ব্যথাময় ঘৃণার অভিব্যক্তির মধ্যে দিয়ে রেখে গেছেন মানবসমাজের সঙ্গে তাঁর নাড়ির বন্ধনের শোনিতচিহ্ন।"[২২]
>
> (জীবনানন্দ সমাজ ও সমকাল— সুমিতা চক্রবর্তী)

"অনেক অপরিমেয় যুগ কেটে গেল;
মানুষকে স্থির—স্থিরতর হতে দেবে না সময়;
সে কিছু চেয়েছে বলে এত রক্ত নদী।
অন্ধকার প্রেরণার মতো মনে হয়"[২৩]

(শ্যামলী)

যুগসময়ের প্রেক্ষাপটে ক্ষতবিক্ষত, রক্তাক্ত, বি বস্ত জীবনানন্দের কবিকণ্ঠে একপ্রকার আর্তস্বর শোনা যায়। যা শুধু বনলতা সেন কাব্যে নয়। অন্যান্য কাব্যগুলিরও অলিন্দে অলিন্দে বিরাজমান। জীবনানন্দের কবি সত্তার এ-আর্তনাদকে অনেক সমালোচক নৈরাশ্যবোধ বলে দূরে ঠেলে দিয়েছেন। কিন্তু যে মৃত্যুত্তীর্ণ জীবনের কথা মানব মনীষার শ্রেষ্ঠ সম্পদ তা জীবনানন্দের কাব্যেও অলক্ষি ত নয়। তাই Optimistic (আশাবাদী) কবি বলে উঠেন— 'সুচেতনা, এই পথে আলো জ্বেলে— এ পথেই পৃথিবীর ক্রমমুক্তি হবে;'[২৪] পৃথিবীতে মৃত্যু, যুদ্ধ, দাঙ্গা, সংকীর্ণতা, অশুভ বুদ্ধি যতই ব্যথিত, বেদনাহত, বিমর্ষ, নিঃস্ব, রিক্ত করুক আমাদের তবুও আমরা জীবনের জয়গান গাইব, মৃত্যুত্তীর্ণ জীবনের কথাই বলব। জীবনানন্দও বলেছেন, তবে তিনি তাকে কিছুটা

ভিন্নভাবে বা ভিন্নরূপে উপস্থাপনের চেষ্টা করেছেন। জীবনানন্দের কবিসত্তার এ আর্তনাদ অনেকটা সম্পূর্ণ বিপদগ্রস্থ জীবের মতো, যা কারও প্রতি বা কোন কিছুকে লক্ষ্য করে নয় কিন্তু যে তার আর্তস্বর শুনতে পাবে ঘরে বসে থাকতে পারবে না সে কখনোও। পরিত্রাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ রহাহূত জীবের মতো আসতেই হবে তাকে।

জীবনানন্দের মৃত্যুতে গভীর শোকাহত সঞ্জয় ভট্টাচার্য লিখেছিলেন—

"একটি জাহাজ ছেড়ে গেল।"[২৫]

সত্যিই আধুনিক বাংলা কবিতার কবিতাবন্দর থেকে ছেড়ে গিয়েছিল জাহাজ। সে জাহাজ আর কোনোদিন ফিরে আসেনি। তাঁর সেই বেদনাবহ যাত্রার কথাও আমাদের সকলের জানা। আমরা কবির ভাষায় কবিকেই শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে বলব—

"মানুষের মৃত্যু হলে তবুও মানব বেঁচে থাকে।"[২৬]

তথ্যসূত্র

১. গঙ্গোপাধ্যায় পার্থজিৎ— জীবনানন্দ।
১৩২২, ২২শে অগ্রহায়ণ লেখা চিঠি,
সাহিত্যলোক ৩২/৭, বিডন স্ট্রীট, কলকাতা ৬
১'ম সংস্করণ - ১ বৈশাখ ১৪০৭/ ১৪ এপ্রিল ২০০০
পৃষ্ঠা. ৮

২. গঙ্গোপাধ্যায় পার্থজিৎ— ঐ, ৩রা অক্টোবর ১৯৩৫ লেখা চিঠি, পৃষ্ঠা. ৯

৩. বন্দ্যোপাধ্যায় দেবীপ্রসাদ — জীবননান্দ ও আমরা।
অনুষ্টুপ, ২-ই, নবীন কুন্ডু লেন, কলকাতা-৯
প্রকাশ : অক্টোবর ১৯৯৯। পৃষ্টা. ৫৬

৪. Sen, S — Robert Frost Selected Poems,
Stopping by Woods on a Snowy evening
Unique Publisher (1) Pvt. Ltd.
Delhi Office: 4574/15, Padam Chand
Marg (Opp. Happy School), Ansari Road, Dariyaganj,
New Delhi 110002,
p. 12

৫. দাশ জীবনানন্দ — সুচেতনা; বনলতা সেন,
সিগনেট প্রেস, কলকাতা-২৩। উনত্রিংশৎ সিগনেট সংস্করণ,
কার্ত্তিক ১৪১৩। পৃষ্ঠা. ৪৪

৬. দাশ জীবনানন্দ — হাজার বছর শুধু খেলা করে; বনলতা সেন, ঐ পৃষ্ঠা, ৩৯।
৭. দাশ জীবনানন্দ — শিকার; বনলতা সেন, ঐ, পৃষ্ঠা. ২১।
৮. দাশ জীবনানন্দ — সুচেতনা; বনলতা সেন, ঐ, পৃষ্ঠা. ৪৪।
৯. দাশ জীবনানন্দ — অন্ধকার; বনলতা সেন, ঐ, পৃষ্ঠা. ২৭।
১০. দাশ জীবনানন্দ — অন্ধকার; বনলতা সেন, ঐ, পৃষ্ঠা. ২৬।
১১. বন্দ্যোপাধ্যায় দেবীপ্রসাদ — ঐ, পৃষ্ঠা. ২৩৮
১২. বন্দ্যোপাধ্যায় দেবীপ্রসাদ — ঐ, পৃষ্ঠা. ২৩৮।
১৩. দাশ জীবনানন্দ — ঘাস; বনলতা সেন, ঐ, পৃষ্ঠা. ১৫।
১৪. বন্দ্যোপাধ্যায় দেবীপ্রসাদ — ঐ, পৃষ্ঠা. ৭৩-৭৪।
১৫. দাশ জীবনানন্দ — কুড়ি বছর পরে; বনলতা সেন, ঐ, পৃষ্ঠা. ১০।
১৬. দাশ জীবনানন্দ — আমি যদি হতাম; বনলতা সেন, ঐ, পৃষ্ঠা. ১৪।
১৭. বন্দ্যোপাধ্যায় দেবীপ্রসাদ — ঐ, পৃষ্ঠা. ৩২।
১৮. দাশ জীবনানন্দ — স্বপ্নের বনিরা; বনলতা সেন, ঐ, পৃষ্ঠা. ৩৩।
১৯. দাশ জীবনানন্দ — সুচেতনা; বনলতা সেন, ঐ, পৃষ্ঠা. ৪৪।
২০. দাশ জীবনানন্দ — সুদর্শনা, ঐ, পৃষ্ঠা. ২৫।
২১. বন্দ্যোপাধ্যায় দেবীপ্রসাদ — ঐ, পৃষ্ঠা. ২৮৮।
২২. চক্রবর্তী সুমিতা — ঐ, পৃষ্ঠা. ৬
২৩. দাশ জীবনানন্দ — শ্যামলী; বনলতা সেন, ঐ, পৃষ্ঠা. ২৯।
২৪. দাশ জীবনানন্দ — সুচেতনা; বনলতা সেন, ঐ, পৃষ্ঠা. ৪৪।
২৫. বন্দ্যোপাধ্যায় দেবীপ্রসাদ — ঐ, পৃষ্ঠা. ১৩৮।
২৬. ভট্টাচার্য সঞ্জয় — কবি জীবনানন্দ দাশ।
ভারবি ১৩/১, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলকাতা ৭৩
পরিমার্জিত সংস্করণ- মাঘ ১৪০১, জানুয়ারী ১৯৯৫
দ্বিতীয় মুদ্রণ - শ্রাবণ ১৪১০, আগস্ট ২০০৩। পৃষ্ঠা. ৫

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

১. দাশ জীবনানন্দ — বনলতা সেন, সিগনেট প্রেস, কলকাতা - ২৩।
উনত্রিংশৎ সিগনেট সংস্করণ, কার্ত্তিক ১৪১৩।
২. বন্দ্যোপাধ্যায় সরোজ — বাংলা কবিতার কালান্তর।
দে'জ পাবলিশিং/ ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০৭৩,
দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৪১৫ অগ্রহায়ণ, নভেম্বর ২০০৮।

৩. মজুমদার উজ্জ্বলকুমার — কবিতার মুখোমুখি।
এবং মুশায়েরা, ৩৮/এ/১ নবীন চন্দ্র দাস রোড,
কলকাতা ৭০০০৯০।
প্রথম প্রকাশ: পৌষ ১৪১১, জানুয়ারি ২০০৫

৪. সিকদার অশ্রুকুমার — আধুনিক কবিতার দিগ্‌বলয়।
অরুণা প্রকাশনী, কলকাতা ৬, প্রথম সংস্করণ: অগ্রহায়ণ ১৩৮১/
অষ্টম মুদ্রণ: বৈশাখ ১৪১৫।

৫. গোস্বামী তপন — জীবনের কবি জীবনানন্দ।
পুস্তক বিপণি ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯।
প্রথম প্রকাশ: সেপ্টেম্বর ১৯৯৮, মহালয়া ১৪০৫।

৬. মিত্র মঞ্জুভাষ — আধুনিক বাংলা কবিতায় ইউরোপীয় প্রভাব।
দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০৭৩,
পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত প্রথম দে'জ সংস্করণ: কলকাতা
পুস্তকমেলা, জানুয়ারী ২০০২, মাঘ ১৪০৮।

৭. ভট্টাচার্য তপোধীর — জীবনানন্দ কবিতার সংকেতবিশ্ব।
প্রতিভাস ১৮/এ, গোবিন্দ মণ্ডল রোড, কলকাতা ৭০০০০২,
দূরভাষ ৫৫৭-৮৬৫৯।
প্রথম সংস্করণ: জানুয়ারী, বইমেলা ২০০১।

৮. ভট্টাচার্য বীতশোক — জীবনানন্দ।
বাণী শিল্প ১৪ এ, টেমারলেন/ কলকাতা ৭০০০০৯।
প্রথম প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি ২০০১।

৯. গঙ্গোপাধ্যায় পার্থজিৎ — জীবনানন্দ।
সাহিত্যলোক ৩২/৭, বিডন স্ট্রীট, কলকাতা ৬।
১'ম সংস্করণ - ১বৈশাখ ১৪০৭/ ১৪ এপ্রিল ২০০০।

১০. ত্রিপাঠী দীপ্তি — আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয়।
দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০৭৩।
পরিবর্তিত ও পরিমার্জিত প্রথম দে'জ সংস্করণ: মাঘ ১৩৮০,
জানুয়ারি ১৯৭৪, পুনর্মুদ্রণ: অক্টোবর ২০০৯, আশ্বিন ১৪১৬।